নির্বাচনের আগে ও পরে

দেশের এগারোটি অঞ্চলে ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ

মাহতাব উদ্দীন আহমেদ

নির্বাচনের আগে দিয়ে উপকূলীয় ১০টি স্থান এবং নির্বাচনের পরে নোয়াখালীর সুবর্ণচরে ঘুরে এসে ওসব এলাকায় গিয়ে এলাকার পরিস্থিতি যা দেখলাম, জানলাম ও বুঝলাম তারই পরিপ্রেক্ষিতে এই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সারসংক্ষেপ। এটা একান্তই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। তাই দৈবচক্র বা আকস্মিকতার কথা মাথায় রেখে এটিকে এলাকার পরিস্থিতির প্রতিনিধিত্বকারী বিবরণ দাবি করা ঠিক হবে না। কারণ নিশ্চয়ই পরিস্থিতির আরও অনেক দিক আছে, যেটা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার রাডারে ধরা পড়েনি, ভ্রমণের সংক্ষিপ্ত সময়কালে ধরা পড়ার কথাও নয়। তার পরও এই বিবরণ আমাদের সাহায্য করতে পারে ওইসব এলাকার পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণা পেতে। কারণ এই বিবরণ ওইসব এলাকার পরিস্থিতির পুরো অংশ না হলেও অন্তত একটা অংশ আমাদের সামনে তুলে ধরবে। তাই এই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা জানানোর তাগিদবোধ।

নির্বাচনের আগে

ডিসেম্বরের ১৫ থেকে ২৪ তারিখ পর্যন্ত আমি ঢাকার বাইরে ছিলাম। লোকাল ট্রান্সপোর্ট ব্যবহার করে 'যেখানে রাত সেখানে কাত' মার্কা ধরনে উদ্দেশ্যহীন, গন্তব্যহীনভাবে ঘুরতে বের হয়েছিলাম। এই ঘোরাঘুরি করতে গিয়ে উপকূলীয় ১০টি স্থান ঘুরে ফেলি। স্থানগুলো হল চাঁদপুর, লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী, হাতিয়া, নিঝুম দ্বীপ, মনপুরা, ভোলা, বরিশাল, বাগেরহাট ও মোংলা। তবে উদ্দেশ্যহীন-গন্তব্যহীনভাবে ঘুরলেও ঘোরাফেরার সাথে সাথে যে এলাকায়ই গিয়েছিলাম, সেখানকার নির্বাচনি পরিস্থিতি নিয়ে এলাকার মানুষের সাথে কথা বলেছিলাম। আমি নিজের কোন মত দেয়া থেকে বিরত ছিলাম। মতামত প্রভাবিত হয় এমন ধরনের কোন প্রশ্ন করা থেকে বিরত ছিলাম। কারণ কথা বলার সময় আমার উদ্দেশ্য ছিল ঘটনা একদম যে রকম ঠিক সে রকমভাবেই জানা, কোন রকম ফিল্টার ছাড়াই। কোন বাছবিচার ছাড়াই, একদম দৈবচয়ন ভিত্তিতে সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলেছি। যত ধরনের মানুষের সাথে কথা বলেছি তাদের মধ্যে ছিলেন চা-সিগারেটের দোকানদার, চায়ের দোকানে আসা খরিদ্দার, বাস-লঞ্চের যাত্রী, ছাত্র, কিশোর, খাবারের রেস্তোরাঁর বয়, মালিক, হোটেল-বোর্ডিংয়ের সুপারভাইজার, ভাড়ার মোটরসাইকেলচালক, রিকশাওয়ালা, ব্যাটারিচালিত অটোরিকশাচালক, সিএনজিচালক, গ্রামের কৃষক, মাদ্রাসার শিক্ষক, মুদি দোকানদার ও ব্যবসায়ী। যেখানে যার সাথেই গল্প জমানোর সুযোগ হয়েছে সেখানেই তাদের মতামত জানতে চেয়েছি নির্বাচন নিয়ে, বুঝতে চেয়েছি এলাকার অবস্থাটা কী। সেখানকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি কিভাবে কাজ করছে।

নির্বাচনি পরিস্থিতি নিয়ে এলাকার মানুষের সাথে কথা বলেছিলাম। আমি নিজের কোন মত দেয়া থেকে বিরত ছিলাম। মতামত প্রভাবিত হয় এমন ধরনের কোন প্রশ্ন করা থেকে বিরত ছিলাম। কারণ কথা বলার সময় আমার উদ্দেশ্য ছিল ঘটনা একদম যে রকম ঠিক সে রকমভাবেই জানা, কোন রকম ফিল্টার ছাড়াই। কোন বাছবিচার ছাড়াই, একদম দৈবচয়ন ভিত্তিতে সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলেছি।

এইসব এলাকায় ঘুরে কোনখানেই মূলত নৌকা ছাড়া আর কোন পক্ষের প্রচারণা চোখে পড়েনি। তবে হাতপাখার উপস্থিতি আছে। নৌকার পক্ষে প্রচলিত পপুলার গানের নির্বাচনি প্যারোডি বেজেই চলতে দেখেছি। বাজারগুলোতে কান ঝালাপালা অবস্থা। প্রতিদিন সকাল ৮টা-৯টা থেকে শুরু হত এই প্রচারণা। চলত রাত ১১টা পর্যন্ত। তবে বরিশাল ও ভোলা শহরের দু-এক জায়গায় ধানের শীষসহ অন্যান্য প্রতীকের পোস্টার চোখে পড়েছিল। কিন্তু সেটা এতই নগণ্য মাত্রায় যে ধর্তব্যের মধ্যে নয়।

চাঁদপুর লঞ্চঘাটে নেমেই দেখলাম দীপু মনিকে নৌকা প্রতীকে ভোটদানের আহ্বান সংবলিত পোস্টার। আর কোন পোস্টার নেই আশপাশে, শুধুই নৌকা আর নৌকা। তবে লঞ্চঘাট থেকে বের হতেই বাজারের এক কোনায় বিএনপি প্রার্থীর কয়েকটা পোস্টার চোখে পড়ে। গভীর রাতে চাঁদপুর বাসস্ট্যান্ডের চা-সিগারেটের দোকানদার, কয়েকজন চাঁদপুরনিবাসী যাত্রী আর এক ড্রাইভার/হেলপারের সাথে প্রায় একান্তেই আলাপ হয়। তাঁরা জানিয়েছিলেন, নির্বাচন সুষ্ঠু হওয়ার কোন সম্ভাবনা তাঁরা দেখেন না। ফেয়ার ইলেকশন হলে বিএনপি/ঐক্যফ্রন্ট জিতবে। সেটা ঠেকাতে আওয়ামী লীগ ও স্থানীয় প্রশাসন একযোগে কাজ করছে বলে তাঁরা জানান। তাঁরা এও জানান যে চাঁদপুরে বিএনপির ভোটারই বেশি। তাঁদের আশঙ্কা ছিল, নির্বাচনের আগে মারামারি লাগবে। বিএনপির কাউকেই এলাকায় নামতেই দিচ্ছে না বলেও তাঁরা জানান। নামলেই নাকি মামলায় ফাঁসানো হচ্ছে বলে তাঁদের ভাষ্য। চাঁদপুরের আরো কিছু সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলে অনুরূপ মতামতই পাওয়া গেল এবং আশ্চর্যের বিষয় হল, দৈবচয়নের ভিত্তিতে যাঁদের সাথে কথা হল তাঁদের কাউকেই পাওয়া গেল না যিনি মনে করেন যে সুষ্ঠু ভোট হলে আওয়ামী লীগ জিতবে। বরং সকলের ভেতরেই একটা চাপা ক্ষোভ দেখা গেল নৌকার বিরুদ্ধে। বাসস্ট্যান্ডের আরেক প্রান্তে আরেক চা-সিগারেটের দোকানে এ বিষয়ে কথা তুললে মানুষজন কথাই বলতে চাইল না। এড়িয়ে গেল।

লক্ষ্মীপুর ও নোয়াখালীর মাইজদী শহর জুড়ে খালি নৌকার পোস্টারই দেখেছি। ভোরবেলা থেকে সকালবেলা পর্যন্ত সময়ে সেখানে যাঁদের সাথেই কথা হয়েছে তাঁরা কেউই সেখানে খুব একটা কথা বলতে চাননি। কেমন যেন একটা চাপা সংকোচ ছিল চোখে-মুখে।

হাতিয়ার অন্তত তিনটি বাজারে বিভিন্ন চায়ের দোকানে আসা মানুষ আর ভাড়ায় যাত্রী বহন করা মোটরসাইকেল চালকদের সাথে কথা বলে তাঁদের যে মতামত জানা গেল তার সারমর্ম হল : হাতিয়ায় বিএনপির

লোকজন বেশি। কিন্তু বিএনপির কর্মীদের দৌড়ের ওপর রাখা হয়েছে। এলাকায় ঢুকতে দেয়া হচ্ছে না। প্রশাসন ও লীগ একযোগে কাজ করছে। এমনকি কয়েক দিন আগে এক ভ্যানচালক হাতিয়ার বিএনপি প্রার্থীর বাসার কম্পাউন্ডে ঢুকেছিল বলে তাকে ধরে লীগের লোকজন নাকি শাসিয়েছে এবং মেরেছে যে সে কেন বিএনপির প্রার্থীর বাসায় গেল! কয়েকজন এও জানালেন যে হাতিয়ার সাধারণ মানুষ নাকি লীগের ওপর খুব খেপে আছে। গত ১০ বছরে কোন কিছুই নাকি সেখানে হয়নি ঠিকমত। ঠিকঠাক নির্বাচন হলে হাতিয়া থেকে লীগ উচ্ছেদ হওয়ার মত পরিস্থিতি সেখানে। আমি হাতিয়া থেকে চলে আসার পরে দেখলাম প্রথম আলোতে খবর বেরিয়েছে হাতিয়ার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অবকাঠামোগত দুর্দশার চিত্র নিয়ে, শিক্ষায় হাতিয়া কতটা পিছিয়ে আছে সেটা নিয়ে। আমি নিজেই দেখেছি, বিভিন্ন চা-সিগারেটের দোকানে বসে থাকা কিশোররা কত টাকা বিল হয়েছে সেটা ঠিকঠাক হিসাব করতে পারছে না, ভুল করছে। তখন ব্যাপারটাতে অত গুরুত্ব না দিলেও পরে প্রথম আলোর রিপোর্ট পড়ে মনে হল, সেটি শিক্ষার নিম্ন হারের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে। অথচ এমন নয় অবস্থাটা যে হাতিয়ায় শুধু গরিব মানুষেরই বাস। বস্তুত সেখানকার বাজারগুলো ঘুরে আমার মনে হয়েছে, সেখানে টাকা-পয়সাওয়ালা বহু মানুষ আছে। এখানকার প্রচুর মানুষ মধ্যপ্রাচ্যে কাজ করে। তবে হাতিয়ায় আওয়ামী লীগ ও বিএনপি দুই দলেরই সমর্থক আছে। আওয়ামী লীগের স্থানীয় এক নেতার ভাতিজা (যিনি লীগ কিংবা বিএনপি কোনটারই সমর্থক নন) জানালেন যে, তাঁর মতে এবার যেটা হাতিয়ায় করার চেষ্টা হতে পারে তা হল, বিএনপির ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে যেতে না দিয়ে শুধু লীগের ভোটারদের পাঠিয়ে কম কাস্টিংয়ে লীগের ভোট বেশি দেখিয়ে লীগকে জেতানো হবে। হাতিয়ার সবচেয়ে বড় বাজার তমিরুদ্দি লঞ্চঘাটের বাজারে একদিন রাতে দেখলাম যে হুমকিমূলক মাইকিং হচ্ছে–"বাজারের যারা এখনও নৌকার পক্ষে আসেননি তাঁদের বলছি, এখনও সময় আছে, নৌকার পক্ষে চলে আসুন। আমরা বাজারের সব ব্যবসায়ী ভাই ভাই। আমরা চাই না কারও কোন ক্ষতি হোক। তাই সবাই নৌকার পক্ষে চলে আসুন।" তবে আশপাশের মানুষকে ব্যাপারটায় তেমন গুরুত্ব দিতে দেখিনি। মজার ব্যাপার হল, সারাক্ষণ নৌকা নৌকা করে গাওয়া নির্বাচনি প্রচারণার আওয়াজের মধ্যেই আমি দেখেছি, বাজারের বিভিন্ন দোকানে টিভিতে যখন খবর হচ্ছে তখন সরকারি প্রপাগান্ডা নিয়ে মানুষ উপহাস করছে, ব্যঙ্গ করছে। তবে হাতিয়ায়ও আমি দেখেছি, মানুষ শুরুতে কথা বলতে চায়নি। কেমন একটা চাপা আতঙ্ক সবার মাঝে। একজন আমাকে জিজ্ঞেস করেই বসলেন যে আমি গোয়েন্দা সংস্থার লোক কি না। পরে তাঁকে অভয় দিলে এবং তাঁর আস্থা অর্জন করলে তিনি জানালেন যে গোয়েন্দা সংস্থার বহু লোক এখন নাকি হরদম আসছে হাতিয়া-নোয়াখালীতে। তারা আমার মতই পর্যটক সেজে নাকি ঘুরে বেড়ায়।

হাতিয়া থেকে যখন প্রত্যন্ত এলাকা নিঝুম দ্বীপে যাই তখন সেখানে একদিন রাতে নামার বাজারে আমার চোখের সামনেই লীগের লোকজন বিএনপির সমর্থকের দোকানে মিছিল নিয়ে তেড়ে গেল ভাঙচুর করতে। ওই ঘটনার পরই মিছিল নিয়ে গিয়ে বিএনপির অফিস ভাঙচুর করে তারা। বিএনপির অফিসে ভাঙচুরের কারণ হিসেবে যা জানা যায় তা হল এই যে ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবসের দিবাগত রাতে আওয়ামী লীগের কর্মীদের উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান থেকে ছুটে যাওয়া বাজি/পটকায় বিএনপির সমর্থক এক দোকানদারের ইলেকট্রিকের দোকানের কিছু সামগ্রী পুড়ে যায় বলে অভিযোগ করে তিনি ১৬ তারিখ সকালে লীগের লোকদের গালমন্দ করেন। তিনি গালমন্দ করলেন কেন, এ কারণেই বিএনপির অফিসে হামলা। তবে বাজারের অনেকেই মত দিলেন, বিএনপির লোকেরা বাড়াবাড়ি করেছে, গালি দেয়াটা ঠিক হয়নি। কারণ এমনিতেই বিএনপির কর্মীদের এলাকায় নামতে দিচ্ছে না। এখানে যা-ও একটা অফিসে তারা কিছু নির্বাচনি গান বাজাতে পারত, এখন সেটাও বন্ধ করার উছিলা দিয়ে দিল তারা আওয়ামী লীগকে। ১৬ তারিখের ঘটনার জের ধরে নিঝুম দ্বীপেরই এক ছোট্ট বাজারে একদিন সন্ধ্যায় লীগের এক পথসভায় এক স্থানীয় নেতা ভাষণ দিলেন দেখলাম : "ধানের শীষের কাউকেই আর মাঠে নামতে দেয়া হবে না।" আশপাশের মানুষ শুনছিল, কিন্তু কোন প্রতিক্রিয়া সেখানে ছিল না।

পোস্টার আর নির্বাচনি প্রচারণার দিক দিয়ে ভোলার মনপুরা আর ভোলা শহরের অবস্থা একই রকম। নৌকা আর নৌকা। আর কেউ নেই মাঠে। তবে মনপুরায় আওয়ামী লীগের এমপি জ্যাকবের ভাল সমর্থন আছে। কারণ এলাকার মানুষের মতে তিনি নিয়মিত এলাকার রাস্তাঘাট ঠিকঠাক করে রাখেন। রাস্তাটা প্রত্যন্ত এলাকা মনপুরার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। তাই মানুষ জ্যাকব সাহেবকে নিয়ে খুশি। তার পরও আশ্চর্যের বিষয় হল, গ্রামের মানুষ – যাদের সাথে কথা বলেছি – তাঁরা বললেন, সুষ্ঠু ভোট হলে বিএনপি আসবে। আমি যখন তাঁদের বললাম যে, এই না বললেন জ্যাকব সাহেব এলাকার অনেক উন্নয়ন করেছেন, তাহলে সুষ্ঠু ভোট হলে তিনি হারবেন কেন বলছেন? এর উত্তরে তাঁরা যা বললেন সেটা চমকপ্রদ। তাঁরা বললেন, জ্যাকব দৃশ্যমান কিছু কাজ করেছেন সেটা ঠিক আছে। কিন্তু এলাকার পাতিনেতারা ইচ্ছামত যা খুশি তাই স্বেচ্ছাচারী আচরণ করে গ্রামের মানুষের নাভিশ্বাস উঠিয়ে দিয়েছে। তাঁদের কথায় এটাও মনে হল যে সম্ভবত জ্যাকব সাহেবের পাতিনেতাদের ওপর যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ নেই। পাতিনেতাদের অত্যাচারে গ্রামের মানুষ অতিষ্ঠ। তাই এই স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেই গ্রামের মানুষ সুযোগ পেলে ধানের শীষকে ভোট দিতে চায় বলে আমাকে জানালেন। স্থানীয় এক মৌলভি সেখানে আমাকে সরাসরি বললেন, "ভাই, আমি আগে ছিলাম প্রকাশ্য ধানের শীষ, আর এখন প্রকাশ্য নৌকা। কারণ উপায় নাই। আমাকে টিকে থাকতে হবে গ্রামে।"

এই না বললেন জ্যাকব সাহেব এলাকার অনেক উন্নয়ন করেছেন, তাহলে সুষ্ঠু ভোট হলে তিনি হারবেন কেন বলছেন? এর উত্তরে তাঁরা যা বললেন সেটা চমকপ্রদ। তাঁরা বললেন, জ্যাকব দৃশ্যমান কিছু কাজ করেছেন সেটা ঠিক আছে। কিন্তু এলাকার পাতিনেতারা ইচ্ছামত যা খুশি তাই স্বেচ্ছাচারী আচরণ করে গ্রামের মানুষের নাভিশ্বাস উঠিয়ে দিয়েছে।

গ্রামের একদম প্রত্যন্ত প্রান্তে একটি রাস্তায় বিএনপির দুর্বল মাইকিং চোখে পড়েছিল। তবে এলাকার মানুষ জানাল, বিএনপির সবাইকেই দৌড়ের ওপর রাখা হয়েছে। আমি মনপুরায় যে বাজারে (হাজিরহাট লঞ্চঘাট) এক রাত কাটিয়েছিলাম, সেখানে রাত ৯টার দিকে বিএনপির কিছু কর্মীকে মারপিট করে এলাকাছাড়া করা হয়। পরদিন সকালে বের হয়ে এই ঘটনা জানতে পারি। বাজারে এক চায়ের দোকানে

কথোপকথন শুনলাম, যেখানে বক্তারা বলছেন যে খোদ পাকিস্তান আমলের নৈরাজ্যকেও হার মানাচ্ছে বর্তমান পরিস্থিতি। তাঁরা বহু নির্বাচন দেখেছেন, কিন্তু এমন নির্বাচনপূর্ব নৈরাজ্য তাঁরা কোন দিন দেখেননি। এখানেও লীগ আর প্রশাসন একযোগে কাজ করছে বলে তাঁরা আমাকে জানান।

হাকিমুদ্দিন লঞ্চঘাট থেকে ভোলা শহরে আসার পথে প্রচারে কোথাও নৌকা ছাড়া আর কোন কিছু চোখে পড়েনি। তবে ভোলা সদরে বিএনপির অফিস চালু আছে। পোস্টারও আছে। তবে তুলনায় অনেক কম। ভোলা সদর তোফায়েল আহমেদের এলাকা। এলাকার মানুষ খুব একটা কথা বলতে চায় না। কেমন যেন একটা চাপা ভয় দেখেছি তাদের মাঝে।

শহর জুড়ে প্রবল প্রতাপে নৌকার প্রচারণা দেখেছিলাম। এমনকি গাড়িতে করে বিশাল বিশাল টিভি স্ক্রিনে নৌকার পক্ষের ভ্রাম্যমাণ প্রচারণা চলছিল। অবস্থাটা এতটাই দাপুটে যে আমি শহরের প্রাণকেন্দ্রে কারও সাথে কথা বলারই সাহস করিনি। কারণ সেখানে মানুষের চোখে-মুখের তটস্থ অবস্থা এবং একই সাথে লীগের লোকজনের নজরদারি বেশ চোখে পড়ছিল। অবস্থা এমনই যে, ভোলা শহরের প্রাণকেন্দ্রে নতুন বাজার এলাকায় রাতে যখন লীগের অফিসের সামনে 'জয় বাংলা জিতবে এবার নৌকা' গানটির সাথে সাথে একজন মানসিক বিকারগ্রস্ত মানুষ নাচতে নাচতে একপর্যায়ে হাস্যকর রকমের অঙ্গভঙ্গি করছিল, যেটা গানটির জন্য অপমানজনক, তখন আশপাশের মানুষ যারা জড়ো হয়ে তামাশা দেখছিল, তাদের হাসি পেলেও তাদেরকে দেখেছি বহু কষ্টে হাসি চেপে রাখতে। পরে শহরের প্রান্তে যাঁদের সাথে গল্প হয়েছে তাঁরা জানালেন, এখানে সদরে সুষ্ঠু ভোট হলেও তোফায়েল সাহেব জিতবেন সেটা প্রায় নিশ্চিত। কারণ বিএনপির যাঁকে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে তিনি যখন পৌরসভার চেয়ারম্যান/মেয়র হিসেবে ছিলেন, তখন এলাকার জন্য কোন কাজই করেননি। ফলে তিনি ভোট পাবেন না। যাঁদের সাথে কথা বলেছি তাঁরা মনে করেন, এখানে তোফায়েলের শক্ত ঘাঁটি হওয়ার কারণে এবং সুষ্ঠু ভোট হলেও তোফায়েলেরই জেতার প্রায় নিশ্চিত সম্ভাবনার কারণে এখানে বিএনপিকে ছাড় দেয়া হয়েছে। তবে ভোলার অন্য আসনগুলোতে বিএনপিকে নামতেই দেয়া হচ্ছে না বলে তাঁরা জানান। তাঁদের কথার সত্যাসত্য যাচাই করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। কিন্তু পরে পত্রিকার খবর মারফত জানা গেছে যে তাঁদের কথা সত্য।

তবে পরদিন সকালে ভোলার দৌলতখানের স্থানীয় একজনের কাছ থেকে জানতে পারি যে ভোলার একটি আসনের বিএনপি প্রার্থী আমি যেদিন সেখানে গিয়েছি তার প্রায় ৮ থেকে ১০ দিন আগে থেকে কার্যত গৃহবন্দি ছিলেন। তাঁর নাম হাফিজ শাহজাহান। সেখানে আরেক গল্প। তিনি যেদিন তিনটি লঞ্চ সহযোগে কর্মীদের নিয়ে ভোলা আসেন তখন তাঁকে লঞ্চ থেকে নামতে বাধা দেয় ছাত্রলীগ। তারা মোটরসাইকেলে করে লাঠিসোঁটা হাতে এসেছিল। পরে তিনি পুলিশ ও র‍্যাবের প্রটেকশনে লঞ্চ থেকে নামেন। কিন্তু তাঁর নেতাকর্মীরা কোন প্রটেকশন পায়নি। তাদের নামতে লীগের লোকজন নাকি বাধা দিচ্ছিল। পরে তারা লঞ্চ ঘুরিয়ে চলে যাওয়ার ভাব ধরে ঘাট থেকে দূরে আরেক জায়গায় লঞ্চ ভিড়িয়ে পেছন থেকে লীগের কয়েক শ কর্মী, যারা লঞ্চঘাট ঘিরে রেখেছিল, তাদের ওপর হামলা চালায়। তাদের হামলায় লীগের লোকজন মোটরসাইকেল ফেলে রেখে পালায়। এই ঘটনার পরে পুলিশ নাকি বিএনপির কর্মীদের নামে ১৫টির মতো মামলা দিয়েছে। প্রায় সব কর্মী এখন এলাকাছাড়া। আর ওই প্রার্থীকে লীগের লোকজন এখন গৃহবন্দি করে রেখেছে। মানে তাঁর বাড়ির চারপাশে নাকি লীগের লোকের পাহারা। রাস্তায় বের হলেই মার খেতে হবে এমন নাকি পরিস্থিতি। তৎক্ষণাৎ তাঁর ওই কথার সত্যাসত্য যাচাই করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। কিন্তু আমি ভোলা থেকে চলে আসার পর যখন প্রথম আলো এই ঘটনা নিয়ে প্রতিবেদন করে তখন বুঝতে পারি যে ঘটনা সত্যই ছিল।

বরিশালে গিয়ে টাউন হলের কাছে আমি ধানের শীষসহ সকল প্রতীকের প্রার্থীরই পোস্টার দেখতে পাই। তার পরও মানুষের সাথে যখন কথা বলতে গিয়েছিলাম তখন সংকোচ দেখেছি তাদের মধ্যে। বরিশালে যাঁদের সাথে কথা বলেছি তাঁরা জানালেন যে নির্বাচন সুষ্ঠু হবে এই অর্থে যে সেখানে কোন মারামারি হবে না। কারণ মারামারি হওয়ার মত পরিস্থিতিই সেখানে নেই। তাঁদের এই কথার মর্ম আমি আরও পরে বুঝতে পারি, যখন বিএনপির এমপি প্রার্থী এককালের দাপুটে এমপি সরোয়ারের ভিডিওটি ফেসবুকে দেখি। সেখানে দেখা যায়, এলাকায় দলবল নিয়ে প্রচারণায় নামতে না পেরে মাত্র একজন সমর্থক–যিনি আবার অ্যাডভোকেট–সাথে নিয়ে তিনি স্পিডবোটে করে প্রচারণায় নামলেও আরেকটি স্পিডবোটে করে লোক এসে তাঁর কাছ থেকে ওই অ্যাডভোকেটকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে।

> "ব্যবসা করো কোন অসুবিধা নাই, তাতে বাধা দেব না। কিন্তু যদি ভোট নিয়ে নাড়াচাড়া করতে আসো, তাহলে কোন ক্ষতি হলে আমরা কিছু জানি না।"

যতগুলো এলাকা দেখেছি তার মধ্যে বাগেরহাটে সবচেয়ে বেশি ভয়ের পরিবেশ দেখেছি। পুরো বাগেরহাট শহর ছিল থমথমে। কোথাও নৌকা ছাড়া আর কোন প্রচারণা নেই (হাতপাখার নগণ্য উপস্থিতি ছাড়া)। মানুষ কথাই বলতে চায় না পারতপক্ষে। বাগেরহাটের দুটি আসনে নৌকা প্রতীকে দাঁড়িয়েছিলেন শেখ হেলাল ও তাঁর ছেলে শেখ তন্ময়। কিন্তু লীগের যতগুলো নির্বাচনি মিছিল বাগেরহাট শহরে দেখেছিলাম তাতে বেশ বোঝা যাচ্ছিল যে মূল ক্ষমতা শেখ হেলালের। শহরের মানুষ এও জানাল যে তন্ময়কে কোন দিন তারা রাজনীতিতে দেখেনওনি। তন্ময় দেশের বাইরেই ছিল। সেখানেই পড়াশোনা করেছে। সে এমনকি ছাত্রলীগের রাজনীতির সাথেও কোন দিন দৃশ্যমানভাবে সম্পৃক্ত ছিল না। বাগেরহাটে গিয়ে আমি প্রথমে যে হোটেলে উঠতে চাইলাম সেখানে গিয়ে দেখি হোটেলে কোন মানুষ নেই। আমি একাই রুম ভাড়া নিতে এসেছি। সন্দেহ হলে যখন প্রশ্ন করি যে কেন আর কোন মানুষ নেই তখন জানতে পারি যে হোটেলের মালিক ও ম্যানেজার বিএনপি করেন। তাই তাঁরা হোটেলে আসতে পারেন না। আর তাই রাজনৈতিক ঝুঁকি আছে এই বিবেচনায় কোন মানুষই এই হোটেলে এখন থাকতে আসে না। পরিস্থিতি বুঝে আমিও তখন আর ওই হোটেলে থাকাটা সমীচীন মনে না করে অন্য হোটেল খুঁজতে থাকি। তখন স্থানীয়রা আমাকে বলল একটা পুরনো হোটেল আছে সেখানে থাকতে। কারণ হিসেবে তারা বলল যে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নাকি এখন সব হোটেলেই পুলিশ নিয়মিত রেইড দিয়ে হয়রানি করছে মানুষকে। সাথে চলছে বিভিন্ন মামলায় ফাঁসিয়ে দেয়ার বাণিজ্য। শুধুমাত্র ওই একটি হোটেলেই পুলিশ নানাবিধ কারণে (সম্ভবত স্থানীয়রা চালায় বলে) এভাবে যখন-তখন অযাচিত রেইড দিয়ে হয়রানি করে না মানুষকে। তবে এই হয়রানি যে ঠিক নির্বাচনকে কেন্দ্র

করেই হচ্ছে তা নয়। বাগেরহাটের পুলিশের এই বাণিজ্য নাকি এতটাই ব্যাপক যে বাগেরহাট একটা অনগ্রসর এলাকা হলেও এখানে পোস্টিং হওয়া কোন পুলিশই বাগেরহাট থেকে নাকি যেতে চায় না। কোন কারণে অন্যত্র বদলি হয়ে গেলেও আবার তদবির করে বাগেরহাটে ফিরে আসে।

বাগেরহাটের স্থানীয় মানুষজন জানাল যে বাগেরহাট শহরে বিএনপির ভাল রকমের জনসমর্থন আছে। সুষ্ঠু ভোট হলে বিএনপি শহরে জিতেও যেতে পারে। কিন্তু ভোট সুষ্ঠু হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই। কারণ সবাইকেই রীতিমত এলাকাছাড়া করে রাখা হয়েছে। এবং রীতিমত ভয়ের রাজত্ব তৈরি করে রাখা হয়েছে। এক ব্যবসায়ী জানালেন যে ব্যবসায়ীদের কাছে গিয়ে লীগের লোকজন নাকি বলে এসেছে যে "ব্যবসা করো কোন অসুবিধা নাই, তাতে বাধা দেব না। কিন্তু যদি ভোট নিয়ে নাড়াচাড়া করতে আসো, তাহলে কোন ক্ষতি হলে আমরা কিছু জানি না।"

আমি থাকা অবস্থায়ই বাগেরহাটের ফকিরহাটে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মারামারির খবর পাই। মোংলায় গিয়ে দেখি, সেখানেও একই চিত্র। খালেক তালুকদারের একচ্ছত্র আধিপত্য এমনই যে মানুষের কথাটি কওয়ার জো নেই। খালেক তালুকদার সেখানে এমপি হিসেবে দাঁড়াতে না পারলেও তাঁর স্ত্রী এমপি পদে দাঁড়িয়েছিলেন। তবে দ্বিগরাজের মানুষের সাথে যখন কথা বলি তখন তারা জানায় যে এখানে সুষ্ঠু ভোট হলেও বিএনপি জিততে পারবে না। কারণ তারা এখানে জামায়াতের একজনকে প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করিয়েছে, যাঁকে মানুষ কোন অবস্থায়ই ভোট দেবে না; খালেক তালুকদারের ওপর যতই মানুষের ক্ষোভ থাকুক। বিএনপি যদি জামায়াতকে দাঁড় না করিয়ে নিজেদের কাউকে এখানে দাঁড় করাত তাহলে হয়ত জিততেও পারত সুষ্ঠু ভোট হলে।

> এইসব বিবরণ শুনতে শুনতে আমার মনে হচ্ছিল যে আমি কোন স্বাধীন দেশের নয়, আমি একাত্তর সালের পাক বাহিনীর কোন কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের কাহিনি শুনছি।

রামপালের সন্নিকটের দ্বিগরাজের মানুষ আমাকে এও জানাল যে তারা ভোট দিতে যাবে না। কারণ গিয়ে কোন লাভ নেই এটা তারা ইতিমধ্যে বুঝতে পেরেছে। রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র নিয়ে তাদের যখন জিজ্ঞেস করি তখন তারা বলল যে আওয়ামী লীগের সাথে সংশ্লিষ্ট মানুষজন এবং যারা জমির ক্ষতিপূরণ পেয়েছে তারা ছাড়া এলাকার আর কেউই এখানে বিদ্যুৎকেন্দ্র হোক সেটা চায় না। কারণটা মোটেও এটা নয় যে তারা সবাই বনজীবী। বরং কারণটা হল নিরাপত্তা। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সুরক্ষা প্রাচীর সুন্দরবন নষ্ট হোক সেটা তারা চায় না। কিন্তু তারা কেমন যেন হাল ছেড়ে দিয়েছে। অসংগঠিত অবস্থার অসহায়ত্ব তাদের চোখে-মুখে কথায় বেশ বোঝা যাচ্ছিল।

এই সব কয়টি এলাকা ঘুরেই আমার কাছে যে জিনিসটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে চোখে পড়েছে তা হল, মানুষের আওয়ামী লীগের প্রতি ক্ষোভ একদম প্রকটভাবে দৃশ্যমান। সুষ্ঠু ভোট হলে এবং ভোট দেয়ার সুযোগ পেলে মানুষ বিএনপিকেই বা ঐক্যফ্রন্টকেই নির্বাচিত করত মূলত আওয়ামী লীগকে শাস্তি দেয়ার জন্য। কিন্তু এজন্য বেপরোয়া হওয়ার প্রতি যথেষ্ট আগ্রহ মানুষের ছিল না। যে আতঙ্ক ও ভয়ভীতির পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছিল, সেই আতঙ্ক ও ভয়ভীতিকে উপেক্ষা করে ভোট ডাকাতি প্রতিরোধ করার জন্য সক্রিয় হওয়ায় মানুষের আগ্রহ ছিল না। মানুষের অবস্থাটা ছিল অনেকটা এমন যে বিএনপি বা ঐক্যফ্রন্টের কর্মীরা যদি প্রতিরোধ করতে পারে তাহলে মানুষ তার সমর্থনে থাকবে। কিন্তু বিএনপি বা ঐক্যফ্রন্টের জন্য নিজেদের জীবন-পরিবারের ওপর ঝুঁকি ফেলতে মানুষ আগ্রহী ছিল না। এর কারণটা সম্ভবত এই যে মানুষ আরও বড় পরিবর্তনের জন্য উন্মুখ যেটার জন্য সে জীবনও বাজি রাখতে পারে। কিন্তু সেই বড় পরিবর্তন আনার মত প্ল্যাটফর্ম যে বিএনপি বা ঐক্যফ্রন্ট নয়, সেটা তারা পরিষ্কার। চলমান ফ্যাসিবাদী আবহাওয়া সম্পর্কে তারা সজাগ। কিন্তু এটাকে কিভাবে প্রতিরোধ করতে হবে সেটা তাদের কাছে পরিষ্কার নয়, কিংবা পরিষ্কার হলেও সেই কাজ করার জন্য উপযুক্ত সংগঠন বা প্ল্যাটফর্ম মানুষ তার চারপাশে দেখেনি। মানুষের নিস্পৃহতার এটাই কারণ বলে মনে হয়েছে। এটা পরিস্থিতির খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা দিক। নির্বাচনের দিন আমরা এটাও দেখেছি যে মানুষ তার পরও তার অসংগঠিত অবস্থায় সাধ্যের মধ্যে সবটুকুই করেছে। তবে পুরো প্রশাসন, পুরো রাষ্ট্রীয় মেকানিজম যেখানে একদিকে, সেখানে এর বিরুদ্ধে তারা সফল হতে পারেনি। ওই সব কয়টি এলাকায়ই যেসব মানুষের সাথে আমি কথা বলেছি তাঁরা ভেবেছিলেন যে সেনাবাহিনী নামলে অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হতে পারে। কিন্তু তাঁদের ধারণাটি যে ভুল ছিল সেটা তো আমরা সেনাবাহিনী নামার পরের অবস্থা থেকেই বুঝতে পেরেছি। নিশ্চয়ই তাঁরাও সেটা বুঝতে পেরেছিলেন। মানুষ অনেক পরিবর্তনই চায়। কিন্তু সব পরিবর্তনের জন্য মানুষ বেপরোয়া হয় না। মানুষের বেপরোয়া প্রতিরোধের জন্য যে শর্ত দরকার সেই শর্ত এই নির্বাচনের সময় উপস্থিত ছিল না। যে মৌলিক পরিবর্তনের জন্য মানুষ বেপরোয়া হতে পারে সেই মৌলিক পরিবর্তন তো আর বিএনপি কিংবা ঐক্যফ্রন্টের দ্বারা আনা সম্ভব নয়, এমনকি সুষ্ঠু নির্বাচন দ্বারাও সেটা সম্ভব কি না সেটাও পরিস্থিতি সাপেক্ষ ব্যাপার। এই নির্বাচনে তাই মানুষ বেপরোয়া হওয়ার আগ্রহ পায়নি। আর এ কারণেই এই নির্বাচনে প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগ যেমন জেতেনি, ঠিক তেমনি মানুষও আসলে হারেনি। মানুষ আসলে অপেক্ষা করেছে। মানুষের এই অপেক্ষাকে সক্রিয়তায় রূপ দেয়ার জন্য দরকার দেশজুড়ে জনগণের পক্ষে কাজ করা অজস্র সাংগঠনিক নেটওয়ার্ক।

নির্বাচনের পর

নোয়াখালীর সুবর্ণচরের ঘটনা এখন সবার জানা। নির্বাচনের পরপরই নৌকায় ভোট না দেয়ার কারণে আওয়ামী লীগের ১০-১৫ জন কর্মী মিলে দলগত ধর্ষণ করে চার সন্তানের জননী পারুল বেগমকে। পত্রিকা মারফত খবরটা জেনে পরিস্থিতি সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে ও বুঝতে গত ৩ জানুয়ারি নৃবিজ্ঞানী নাসরিন সিরাজ ও আমি ঘটনাস্থলে যাই। আমি সেখানে যা যা দেখেছি এবং শুনেছি তার বিস্তারিত বিবরণ দিতে চাই। কারণ এই বিবরণ আমাদের সাহায্য করবে আরও ভাল করে পরিস্থিতি বুঝতে। যে হাসপাতালে এখন পারুল বেগমকে রাখা হয়েছে, সেখানে গিয়ে আমাদের সাথে পারুল বেগমের স্বামী, সন্তান ও প্রতিবেশীদের দেখা হয়। তারপর তাঁর সন্তান ও প্রতিবেশীদেরকে সাথে নিয়ে আমরা যাই পারুল বেগমের সুবর্ণচরের বাড়িতে। আমরা গ্রামবাসী ও প্রতিবেশীদের সাথে কথা বলে জানতে পারি, পারুল বেগম এলাকায় বেশ সরব কণ্ঠ ছিলেন। তবে তিনি বা তাঁর দরিদ্র সিএনজিচালক স্বামী কেউই বিএনপির কর্মী নন। তাঁরা কেবল সমর্থক। শুধু এই জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করেই নয়, বরং বহু আগে থেকেই স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা রুহুল আমিন ও তাঁর লোকজন পারুল বেগমের পেছনে লেগে ছিলেন। কারণ বিগত ইউনিয়ন পরিষদ

নির্বাচনের (তাঁদের ভাষায় মেম্বার নির্বাচন) সময় পারুল বেগম রুহুল আমিনের বিপক্ষে কাজ করেছিলেন। তখন থেকেই রুহুল আমিন ও তাঁর দলবলের পারুল বেগমের ওপর আক্রোশ। নানাভাবে তাঁরা পারুল বেগমকে উত্ত্যক্ত করতেন। কিন্তু সাহসী নারী পারুল বেগম চলতে-ফিরতে রাস্তাঘাটে সেসবের উত্তরও দিতেন।

গত ৩০ ডিসেম্বর জাতীয় নির্বাচনের দিনও পারুল বেগমকে তারা নৌকায় ভোট দিতে চাপাচাপি করে এবং হুমকি দেয়। কিন্তু তিনি ধানের শীষে ভোট দিয়ে আসেন। এতে ক্ষিপ্ত হয় তারা। পরে নির্বাচনের পর গভীর রাতে পারুল বেগমরা যখন ঘুমাতে যাচ্ছিলেন তখন প্রথমে তাঁর টিনের ঘরের বাইরের রুমে যেখানে টিন লাগোয়া খাটে তাঁর বড় ছেলে শুয়েছিল, সেই টিন ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপ দিয়ে কেটে ফেলে আওয়ামী লীগের কর্মীরা এবং দরজায় কোপ দিতে থাকে। পারুলের অসুস্থ স্বামী এসময় ভেতরের ঘরে শুয়ে ছিলেন। পারুলরা যখন আতঙ্কিত হয়ে জিজ্ঞেস করে যে কে, তখন তারা উত্তর দেয় যে তারা আইনের লোক। এতে সন্দেহ হলে পারুলরা দরজা না খুলে ভেতর থেকে প্রশ্ন করতে থাকলে একপর্যায়ে তারা হুমকি দেয় যে দরজা খোলা না হলে দরজা ভেঙে ভেতরে ঢোকা হবে। এরপর দরজা খুলতে বাধ্য হলে তারা সবাই একযোগে পারুলদের ঘরে ঢুকে পড়ে। এসময় ঘরের লাইটের আলোয় তাঁরা দেখতে পান যে স্থানীয় আওয়ামী লীগের কর্মীরাই, যারা রুহুল আমিনের চ্যালা-চামুণ্ডা হিসেবে পরিচিত, যারা পারুলকে নিয়মিত উত্ত্যক্ত করত, তারা বড় বড় মোটা মোটা লাঠি, রামদা, চাপাতি, শাবলসহ ধারালো অস্ত্র হাতে তৈরি হয়ে এসেছে। ঘরে ঢোকার সাথে সাথেই তারা ঘরের লাইট বাড়ি মেরে ভেঙে ফেলে। এরপর তারা প্রথমে পারুলের ১৪ বছর বয়সী মেয়েকে ধর্ষণ করতে উদ্যত হয়। এসময় পারুল তাদের গিয়ে বলেন যে তাদের যাবতীয় আক্রোশ তো তাঁর ওপর। তাই তাদের যা করার সেটা যেন তাঁর সাথে করে। তাঁর মেয়েকে যেন ছেড়ে দেয়া হয়। তখন একপর্যায়ে আক্রমণকারী আওয়ামী লীগের কর্মীরা পারুলের অসুস্থ স্বামী সিরাজুল ইসলামকে তিনি যেখানে শুয়ে ছিলেন সেই খাটের সাথে বেঁধে ফেলে আর পারুলের চার ছেলেমেয়েকে বেঁধে ফেলে আরেক ঘরে। পারুলের স্বামী ও তাঁর সন্তানদের সবারই মুখ বেঁধে ফেলা হয়। এসময় লুট করা হয় পারুলদের বহু কষ্টে সঞ্চিত ৪০ হাজার টাকা এবং কিছু স্বর্ণালংকার। এরপর দুই ঘরেই পাহারায় লোক বসিয়ে বাকিরা পারুলকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে ছুড়ে ফেলে তাঁরই উঠানে। এসময় তারা পারুলকে হুমকি দেয় যে যদি পারুল চিৎকার করে তাহলে তাঁর সন্তানদের মেরে ফেলা হবে। এরপর পারুল বেগমের ওপর রাতভর নির্যাতন চলে তাঁর নিজেরই বাড়ির উঠানে। উঠানের পাশে একটি পুকুর ছিল, যেই পুকুরপারে হয়ত পারুল বেগম বসতেন শীতের রোদ পোহাতে। একপর্যায়ে সেই পুকুরপারে কাঁঠালগাছের নিচে চলে এই অকথ্য নির্যাতন। আওয়ামী লীগের কর্মীরা তাঁকে কেবল দলবদ্ধভাবে ধর্ষণ করেই ক্ষান্ত হয়নি, কোদালের কিংবা কুঠারের পেছনে যেরকম মোটা লাঠি থাকে সেই মোটা লাঠি দিয়ে তাঁকে ভয়াবহভাবে পিটিয়েছে। একপর্যায়ে তাঁর এক হাত ভেঙে যায়। শুধু তা-ই নয়, ধর্ষণ করে ফেলে রেখে যাওয়ার সময় তারা পারুল বেগমের গায়ে মূত্রত্যাগ করে দিয়ে যায়। পরে আমরা হাসপাতালে গিয়ে জানতে পারি, তাঁর সারা শরীরে কালশিটে পড়েছে এবং শরীরে ৫২টি কামড়ের দাগ ছিল। এইসব বিবরণ শুনতে শুনতে আমার মনে হচ্ছিল যে আমি কোন স্বাধীন দেশের নয়, আমি একাত্তর সালের পাক বাহিনীর কোন কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের কাহিনি শুনছি। আপনাদেরও কি তা-ই মনে হচ্ছে না? পারুল বেগম এখন হাসপাতালে। হয়ত একসময় তিনি শারীরিকভাবে সেরেও উঠবেন। হয়ত জনরোষের চাপে পড়ে এই ঘটনায় জড়িতদের শাস্তিও দেয়া হবে। কিন্তু যে আঘাত তাঁর মনের গভীরে গেঁথে রইবে, যে অপমানের দুঃসহ স্মৃতি তাঁকে তাড়া করে ফিরবে তাঁর ঘরের প্রতিটি কোনায়, তাঁর উঠানে, তাঁর রান্নাঘরের সামনে, তাঁর উঠানের গাছগুলোর নিচে, তাঁর পুকুরঘাটে–সেই আঘাত, সেই অপমান তিনি কী করে ভুলবেন? সরকারপন্থী বুদ্ধিজীবী আর 'নারীবাদী'রা কোন উন্নয়নের গল্প শুনিয়ে তাঁকে ভোলাবেন? পারবেন কি? কিংবা পারুলের যে সন্তান ধর্ষকরা চলে যাওয়ার পরে পারুলকে অজ্ঞান, রক্তাক্ত ও বিবস্ত্র দেখে লজ্জা পেয়ে আবার ঘরে ঢুকে পড়তে বাধ্য হয়েছিল, সেই সন্তানের কাছে আপনারা কোন চেতনার গালগল্প শোনাবেন? কী দিয়ে তাকে ভোলাবেন? পারুল বেগমের কথা বাদই দিই, পারুল বেগমদের পালিত যে কুকুরটিকে ধর্ষকরা গাছের সাথে বেঁধে রেখেছিল পারুলকে ধর্ষণ করার আগে, সেই কুকুরটির সামনেও কি কোন দিন এই আপনারা মুখ তুলে তাকাতে পারবেন?

গ্রামের মানুষ আমাদের এমনটাও বলেছে যে রুহুল আমিন গংয়ের কাজই হচ্ছে ঘরে ঘরে এভাবে মেয়েদের ওপর হামলা করা। আমরা মাত্র ঘণ্টাখানেকের কথাবার্তায়ই এরকম তিনটি ঘটনার কথা জানতে পারলাম, যেখানে মহিলারা নিজেরা এসে আমাদের বলেছেন যে তাঁদের পরিবারের মেয়েদেরও ধর্ষণ করা হয়েছিল এবং কোনটারই কোন বিচার হয়নি।

আমরা গ্রামের মানুষের কাছ থেকে আরও জানতে পারি যে আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতা রুহুল আমিন ও তাঁর চ্যালা-চামুণ্ডারা এমন কাজ যে এই প্রথম করল তা নয়। এমন কাজ তারা আগেও বহুবার করেছে। ১০ বছর ধরে চলছে তাদের অত্যাচার। ধর্ষণ ছাড়াও গাছ কেটে নেয়াসহ তাদের নানাবিধ অত্যাচারের কথাও তারা আমাদের জানাল। গ্রামের মানুষ আমাদের এমনটাও বলেছে যে রুহুল আমিন গংয়ের কাজই হচ্ছে ঘরে ঘরে এভাবে মেয়েদের ওপর হামলা করা। আমরা মাত্র ঘণ্টাখানেকের কথাবার্তায়ই এরকম তিনটি ঘটনার কথা জানতে পারলাম, যেখানে মহিলারা নিজেরা এসে আমাদের বলেছেন যে তাঁদের পরিবারের মেয়েদেরও ধর্ষণ করা হয়েছিল এবং কোনটারই কোন বিচার হয়নি। শুধু তা-ই নয়, অবস্থা এতটাই ভয়াবহ যে এদের অত্যাচারে যেসব পরিবারে মেয়েরা বড় হয়েছে সেসব পরিবার সুযোগ থাকলে মেয়েদের এলাকা থেকে বাইরে পাঠিয়ে দিচ্ছে ধর্ষণের হাত থেকে রক্ষা করতে। কারণ এলাকায় থাকলেই এদের হাতে ধর্ষণের শিকার হতে হবে, এ ব্যাপারে তাঁরা প্রায় নিশ্চিত। একজন মহিলা আমাদের জানালেন, ধর্ষণের আশঙ্কায় তাঁর মেয়েকে তিনি ঢাকায় পাঠিয়ে দেয়ার পর যেদিন মেয়ে ঈদের বন্ধে বাড়ি আসে তখন বাজারে গিয়ে কানাঘুষা শুনতে পান যে রুহুল আমিনের লোকরা ওইদিন রাতে তাঁর বাড়িতে আক্রমণ করার পরিকল্পনা আঁটছে। তখন তিনি আর বিলম্ব না করে সাথে সাথেই মেয়েকে বাসা থেকে বের করে বেড হাতে বের হন এবং মেয়েকে সুবর্ণচর থেকে চৌমুহনীতে নিয়ে ঢাকার গাড়িতে উঠিয়ে দিয়ে তারপর বাড়িতে ফেরেন। এইভাবে নিজের এলাকা থেকে সুবর্ণচরের মেয়েদের বিতাড়িত হতে বাধ্য হওয়ার সাথে মিয়ানমারের রোহিঙ্গাদের নিজ ভূমি থেকে বিতাড়িত হওয়ার ঘটনার কি খুব বেশি পার্থক্য আছে?

স্থানীয় মানুষ আমাদের কাছে আরও অভিযোগ করে যে নির্বাচনের দিন রাতে রুহুল আমিন ও তাঁর দলবল ধানের শীষে ভোট দেয়া আরও কতগুলো পরিবারের মেয়েদের ওপর হামলার পরিকল্পনা করেছিল। কিন্তু মানুষের পাহারার কারণে সেই পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। পারুলের স্বামীর সাথে কথা বলে আমরা জানতে পারি যে পুলিশ প্রথমে যে এফআইআর লিখেছিল, সেটাতে তিনি মূল হুকুমদাতা রুহুল আমিনসহ মোট ১৩ জনের নাম দিয়েছিলেন। কিন্তু পুলিশ রুহুল আমিনসহ আরও চারজনের নাম সেটিতে অন্তর্ভুক্ত করেনি। ফলে তিনি সেই এফআইআর প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু সাহসী পারুল বারবারই মিডিয়ার সামনে রুহুল আমিনের নাম নেন এবং ইতোমধ্যেই দেশজুড়ে জনরোষ ও বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়তে থাকে। একপর্যায়ে পুলিশ রুহুল আমিনকে গ্রেফতার করলেও এখন পর্যন্ত এফআইআরে পারুলদের অভিযোগ অনুসারে মূল হুকুমদাতা রুহুল আমিনের নাম নেই। এখন চাপে পড়ে রুহুল আমিনকে গ্রেফতার করা হলেও পরে যে তিনি এই আইনি ফাঁকটা কাজে লাগিয়ে বের হয়ে যাবেন না তার নিশ্চয়তা কে দিতে পারে? পারুলকে যারা ধর্ষণ করেছিল তারা বেশির ভাগই ইটভাটায় কাজ করে বলে গ্রামের মানুষ আমাদের জানায়। রাজনৈতিক প্রশ্রয় ও মদদ ছাড়া এদের কি কখনও এতটা সাহস পাওয়া সম্ভব যে একজনের বাড়িতে গিয়ে তাঁর উঠানে তাঁকে ধর্ষণ করে আসবে?

পারুলদের বাড়িতে স্থানীয়দের সাথে কথা বলার সময়ই কয়েকজন স্থানীয় বৃদ্ধ আমাদের সাথে যোগ দেন। তাঁদের একজন আমাকে তাঁর হাত বাড়িয়ে দেখান যে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কিভাবে তাঁকে প্রহার করেছে তাঁর ছেলের থেকেও বয়সে ছোট আওয়ামী লীগের কর্মীরা। তাঁর লুঙ্গিতে রক্তের দাগও আমাকে তিনি দেখান। তবে সচরাচর যেমনটা হয়, এসব ধর্ষণের ক্ষেত্রে যে 'মেয়েটাই বেশি বাড়াবাড়ি করেছে' এজাতীয় কথাবার্তা আমরা একজনের মুখ থেকেও শুনিনি। বরং তাঁরা সবাই একই সুরে কথা বলেছেন যে কী পরিমাণ জুলুম করা হয়েছে পারুলের ওপর এবং তাঁরা সবাই এর বিচার চান। আমি তখন একপর্যায়ে এক বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করি, এত এত ক্ষোভ যেখানে জমে আছে, এত বড় জুলুম যেখানে করা হল, সেখানে এলাকায় কেন প্রতিবাদ হচ্ছে না? তিনি তখন অস্ফুটে শুধু বললেন, 'প্রতিবাদ...।' বলে থেমে গেলেন। তখন আমি তাঁর যে চোখ দুটো দেখলাম, সেই চোখের কথা হয়ত আমি কখনই ভুলব না। কোনায় চিকচিক করা সেই চোখে ছিল এক অসহ্য ব্যথা, যেটা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। সেই চোখে ছিল অসংগঠিত জনগণের তীব্র আকুতি, তীব্র অসহায়ত্ব। সেই চোখ আমাকে মর্মে মর্মে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল এতক্ষণ যে ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা শুনছিলাম তার কথা, ধর্ষকদের প্রবল প্রতাপশালী রাজনৈতিক পরিচয়ের কথা, প্রশাসনের নির্বিকারচিত্ততা-অসংবেদনশীলতার কথা, ধর্ষকদের রক্ষা করার চেষ্টার কথা, এলাকার এজাতীয় একটা ঘটনারও যে বিচার হয়নি তার কথা। সেই চোখে যারা এই ব্যবস্থার জন্য দায়ী তাদের প্রতি এক তীব্র অভিশাপও আমি দেখেছিলাম। ধর্ষিতার প্রতি প্রশাসনের অসংবেদনশীলতার আরেক নমুনা আমরা পাই পরে যখন পারুলদের বাড়ি থেকে আবার নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে যাই পারুলকে দেখতে। সেখানে নৃবিজ্ঞানী নাসরিন সিরাজ পারুলের কেবিনে ঢুকে দেখতে পান, রুমে দুটি বেড। একটিতে পারুল চাদর গায়ে শুয়ে আছেন। ঘরে মহিলা পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর পাশের বেডে এক পুরুষ পুলিশ হেলান দিয়ে শুয়ে শুয়ে তাঁর মোবাইল টিপছেন!

তবে আমরা একটু অবাক হয়েই আবিষ্কার করলাম যে গ্রামের মানুষ আমরা ওখানে যাওয়ার দিন পর্যন্ত ঢাকাসহ দেশের নানা জায়গায় পারুলের ধর্ষণ নিয়ে যতগুলো বিক্ষোভ হয়েছে তার প্রতিটির খবরই তারা রাখে। মিডিয়া সেসব খবর সবগুলো না দিলেও ফেসবুক মারফত তারা এসব জেনেছে বলে জানায়। শুধু তা-ই নয়, এসব বিক্ষোভে তারা নিজেরাও বেশ উদ্দীপ্ত বলে মনে হয়েছে। উল্লেখ্য, আমরা চলে আসার এক দিন পর সেখানেও বিক্ষোভ হয় বলে আমি জানতে পারি। বছরের প্রথম দিন থেকেই পারুল বেগমের ধর্ষণের ঘটনায় সারা দেশের বিভিন্ন জায়গায় একের পর এক বিক্ষোভ চলছেই। নানাবিধ গ্রুপ থেকে হচ্ছে এই বিক্ষোভ, যেটা চলমান থাকা খুবই জরুরি।

বিচারের দাবিতে বিক্ষোভরত কারও কারও কাছেও আপাতদৃষ্টিতে "ধর্ষকের কোন দল নাই" কথাটা একটি 'শুভবোধসম্পন্ন' ও 'অরাজনৈতিক' কথা বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এই কথা প্রচার করার পেছনে খেলা করছে এক নোংরা রাজনীতি। আর তা হল ধর্ষকের দলীয় পরিচয় আড়াল করার রাজনীতি। সুবর্ণচরের ওই বৃদ্ধের চোখ দুটোতে আমি জুলুমের রাজনীতির বিরুদ্ধে সংগঠিত হওয়ার তীব্র আকুতিটাই দেখেছি। সেই সাহসী পারুল বেগমের মনেও এই প্রশ্ন ঘুরছে–যে প্রশ্ন তিনি নৃবিজ্ঞানী নাসরিন সিরাজকে করেছেন যে "দশ বছর হোক কি বারো বছর হোক, ওরা তো এর প্রতিশোধ নেবেই, তখন আমি কী করব?" পারুল বেগমের এই প্রশ্নের উত্তর আমরা জনগণ কিভাবে দিই তার ওপর শুধু পারুল বেগমই নয়, আমাদের সবার ভবিষ্যৎই নির্ভর করছে।

* নির্বাচনের পর শিরোনামে এই লেখার অংশটুকু গত ১০ জানুয়ারি অনলাইন ম্যাগাজিন "ঠোঁটকাটা" এবং অনলাইন পোর্টাল মুক্তিফোরামে "সুবর্ণচরের এক জোড়া চোখ এবং ধর্ষকের দলীয় পরিচয় আড়াল করার রাজনীতি" শিরোনামে প্রকাশিত লেখার কিছুটা সংক্ষিপ্ত রূপ।

মাহতাব উদ্দীন আহমদ: লেখক, সাংবাদিক।
ইমেইল: mahtabjuniv@gmail.com

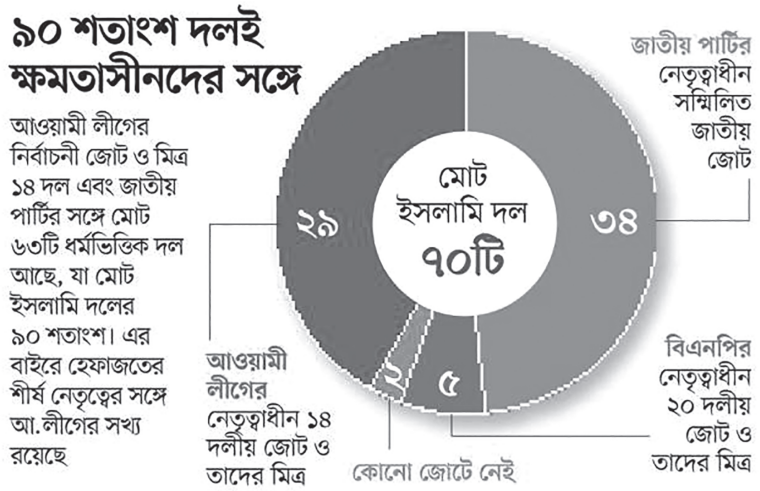

সূত্র: প্রথম আলো, ২ নভেম্বর, ২০১৮